গুপ্তধন

মোল্লা বাহাউদ্দিন

গুরগন খা বলল, হিস্যা আধা আধা। আপ রাজী হ্যায় তো খাজানা কা পুরা পাত্তা আওর ডায়াগ্রাম দিতা হো - বলে আনিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনা পরিশ্রমে এমন একটা গুপ্তধনের খবরে আনিসের কোন ভাবান্তর দেখা গেলনা। মনে হল সে কোন এক গভীর অতলে তলিয়ে গেছে। সেখান থেকে সহসা ফিরে আসা যায়না। তার এই নির্লিপ্ত ভাব গুরগন খার আস্থাকে আরও মজবুত করে দিল। এমন একজন মানুষই খুজছিল সে গত দশটা বছর ধরে। একজন ঈমানদার, নির্লোভ, বিশ্বস্থ। যার উপর বিশ্বাস করে এই খাজানার হদিস দেয়া যায় এবং কিছু ভাগ পাওয়া যায়। তাছাড়া আনিসের নামের পেছনে মোল্লা পদবীটা তাকে আরও ঈমানদার করে তুলেছে। গুরগন খা স্থির নিশ্চিত যে, তার কাঙ্খিত লোক এতদিনে পেয়ে গেছে। মনে মনে একটা হিসেবও করে নিয়েছে। দশ/বার কেজি! আধা পেলেই অনেক! পাঁচ/ছয় কেজি কম নয়! পাকিস্তানে এর দাম কত হতে পারে তারও একটা হিসেব করে নিয়েছে মনে মনে। যা পাওয়া যায় তাই তার লাভ। কারন সেই খাজানার কাছে সে কোনদিনই পৌছতে পারবেনা। কোন অবস্থাতেই সেখানে পৌছা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

মাসখানেক হল আনিস এই সৌদি কোম্পানীতে যোগদান করেছে। প্রথম দিনেই প্রায় সকলের সাথে পরিচয় হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ কাজ করে এই কোম্পানীতে। শুধু বাংলাদেশি নেই। বেশ কিছু পাকিস্তানি আছে। প্রতিদিন সকালে যখন দেখা হয় তখন সালাম ও কুশলাদি বিনিময় হয় সকল কর্মচারিদের সাথে। কিন্তু গুরগন খার শ্রদ্ধা ভক্তিটা যেন আলাদা। দেখা হলেই সালাম দিয়ে বুকে বুক মিলায়, হাতে হাত মিলায়। হাত কচলিয়ে নরম সুরে গদ গদ হয়ে কথা বলে। মাঝে মাঝে চা কফি নিয়ে খুব আদবের সাথে পরিবেশন করে। যদিও এটা তার কাজ নয়। সে একজন ড্রাইভার। একবারে সাচ্চা মুসলমান। সব সময় মাথায় টুপি, মুখে দাঁড়ি। নামাজের আগেই সে সব ব্যবস্থা করে আজান দেয়। সকলের সাথে জামাত পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই আনিসের সাথে তার একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে উঠল।

সেদিন নামাজশেষে, হাত কচলিয়ে গুরগন খা বলল, মেরা কুচ বাত হ্যায় ....খুব গোপনীয় .. অনুমতি করেন তো আপনার বাসায় আসতে পারি।

বিদেশে একটা সুবিধে নানা দেশের নানা লোক। কে কোন দেশের সেটা বড় কথা নয়। সকলেই বিদেশী। তারপরও অলক্ষে একটা গোপন সমর্থন থাকে। সেটা হতে পারে ভাষায়, ধর্মে, ভৌগলিক ইত্যাদি যে কোন একটা। স্বভাবতঃই পাকিস্তানের প্রতি একটা নজর থাকে। পাকিস্তানী জনগনের অনেকেই জানেনা আসলে বাংলাদেশে কি ঘটেছিল। হয়ত বা গুরগন খা তার বেতন বাড়ানোর জন্য কিছু বলবে যেমন অনেকেই বলেছে। হয়ত আপন মনে করে আলাদা ভাবে কিছু বলতে চায়। একজন মুসলমান হিসেবে তাকে অনুমতি দিতেই হয়।

সেদিন ছিল শুক্রবার। অফিস বন্ধ। জুম্মাশেষে গুরগন খা গেল আনিসের বাসায়। অনেক ভনিতা করে, হাত কচলিয়ে, বিনীত সুরে - আনিসের এবং তার বংশের বহু গুনকীর্তন করে খাজানার গল্প শুরু করে দিল। খাজানাটা যে ছহিছালামতে এখনও সেখানে আছে তাতে গুরগন খার কোন সন্দেহ নেই। কারন ওখানে কোন কারনেই কেউ কোনদিন মাটি খুড়তে যাবেনা। মাটির নীচেই পড়ে আছে এবং থাকবে। এই কিমতি চিজ মাটির নীচে পড়ে থাকার চেয়ে আধা আধা ভাগ করে নেয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

আনিসের মাথায় হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে! ঝিম ঝিম করছে! ১৯৭১ সালেও মাঝে মাঝে এমনি হত। যখন শুনতে পেত কোথায়ও কোন রাজাকার কোন গ্রাম লুট করেছে, নিরীহ মানুষ খুন করেছে বা মা বোনের ইজ্জত লুটেছে। অথবা কোথায়ও কোন মুক্তিযোদ্ধা আহত বা নিহত হয়েছে। মাথাটা এমনি ঝিম ঝিম করত। ঘাসের উপর বা কাঁকড়ের উপর কতক্ষন চিৎ

হয়ে পড়ে থাকত। আজকে সোফার উপর পড়ে রইল কিছুক্ষন। নিজকে সামলাতে চেষ্টা করছে। গুরগন খা এখন মেহমান! এটা সৌদি আরব! খুনের বদলা খুন!

তার চেহারা দেখে গুরগন খা মনে করল আনিস বোধ হয় বেজার হয়ে গেছে। তাকে খুশি করার জন্য বলতে লাগল - যদিও যুদ্ধের সময় আমি বাংলাদেশে ছিলাম কিন্তু একটাও খারাপ কাজ করিনি। ওসব ছিল রাজাকার আলবদরদের কাজ। ওরা লুট করে এনে আমাদেরকে ভাগ দিত। আমরা না নিলে ওগুলো পড়ে থাকতনা। রাজাকারেরাই নিয়ে নিত। আপসে এয়সা কিমতি চিজ কেউবা না নেয়! এখন খাজানার মালিক যে পাবে সেই। তার চেয়ে আপনি উঠিয়ে নিন - আমাকে দয়া করে যা দেবেন তাই আমার লাভ।

আরও কিছু শোনার জন্য প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিল আনিস। জিজ্ঞেস করল, আমার মাঝে তুমি এমন কি পেলে যার জন্য এতবড় বিশ্বাস জন্মাল তোমার? আমি তো তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারি! কোন্ বিশ্বাসে তুমি আমাকে খাজানার খবর দেবে?

আপনি সাচ্চা মুসলমান। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে সে ঈমানদার মুসলমান। তাই আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে ঠকাবেন না।

এই সুযোগে আরও কিছু জানার জন্য আনিস বলল, দেখ, দেশ থেকে চলে এসেছি অনেক দিন। যুদ্ধে দেশটার কি হয়েছে তা কিছুই জানিনা। শুনেছি অনেককিছু বদলে গেছে। একবার যাব দেশটা দেখে আসব। আচ্ছা, তোমার সেই খাজানাতে কি আছে?

ছোনা! ছোনা! ছোনার গেয়না! বালা, আঙুটি, নেকলেস সেট, চেইন এয়সা কিমতি চিজ। এক পিস্তল ভি আছে!

কত হবে সোনা?

এই ধরুন দশ/বার কেজি হবে!

এত সোনার অলংকার কোথায় পেলে তুমি? দোকান লুট করেছিলে বুঝি?

নেহি! নেহি! আমরা লুট করিনি! লুট করেছে বাঙ্গাল রাজাকাররা! আমরা ভাগ পেতাম! আর ওই সব আমার একার নয়! আরও দুজনের হিস্যা আছে!

আরও দুজন? ওরা কারা?

ফৌজি আদমি! মুক্তিরা খতম করে দিয়েছে! বাদ মে হামি ওদের হিস্যা উঠা লিয়া!

মুক্তি! এ আবার কি চিজ?

বহুত খতরনক চিজ বাঙ্গাল কা। আমরা মুক্তির নাম শুনলেই পজিশন নিয়ে নিতাম! পঞ্চাশ মাইলের ভেতর কোন মুক্তি না থাকলেও কেউ যদি মুখে নাম নিত অমনি পজিশন নিয়ে নিতাম! ওরা যে কোন দিক দিয়ে আসত আর কোন দিক দিয়ে যেত তা টেরই পেতাম না। বহুত ফৌজকো মার ডালা! মুক্তিনে ও দুনো কো ভি মার ডালা!

তাহলে এখন একাই তুমি ওই খাজানার মালিক?

জ্বি জনাব!

খাজানাটা কোথায়?

ঢাকা কেন্টনমেন্ট রেল ষ্টেশনের পাশে। রেল লাইন পেরিয়ে ৫০ গজ পূর্বদিকে যাবেন। রাস্তার ডানপাশে বড় একটা গাছ। গাছটার পাঁচটা বড় বড় শেকড় আছে। পূর্বদিকের দুটা শেকড়ের মাঝখানে, মাটির নীচে একটা কাপড়ের পুটুলি। পিস্তল আর কাপড়টা নিহত ফৌজের। মাটির নীচে চাপা দিয়ে তার উপর ঘাস লাগিয়ে দিয়েছিলাম! এখন হয়ত ঝোপঝাড় হয়ে গেছে।

আনিসের ভেতরের রয়েল বেঙ্গলটা আড়মোড়া দিয়ে উঠল অনেকদিন পর। রক্ত টগবগ করতে লাগল। মনে হল কসবার শালদানদী রণক্ষেত্র! সামনে বর্বর বাহিনীর বাংকার! এই বুঝি ঝাপিয়ে পড়বে, একটা গ্রেনেড ছুড়ে দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে ওই শত্রুর দেহটাকে! অনেক কষ্টে টাইগারটাকে বশে এনে জিজ্ঞেস করল, তুমি ত তখন বাংলাদেশে ছিলে। ওখানে আসলে কি হয়েছিল কিছু বলত শুনি!

আনিসকে খুশি করার জন্য গুরগন খা একটু নড়েচড়ে বসল। কয়েক মুহূর্ত নিরব রইল। হয়ত ভাবছে কোথা থেকে কোন্ অপরাধ দিয়ে শুরু করবে। তারপর মোলায়েম সুরে, তাজিমের সাথে, হাত কচলিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল -

আমরা ফৌজি লোক। আদেশের চাকর। আদেশ যা করবে তাই তামিল করতে হবে। আমাদের উপর আদেশ ছিল সব বাঙ্গাল খতম করে দাও। মারার পর বলে দাও হিন্দু দুস্কৃতিকারি। আমরা সেভাবেই আদেশ পালন করছিলাম। বাঙাল মুলুক খালবিল আর পানির দেশ। আমরা সব জায়গায় পৌছতে পারতাম না। তাই রাতারাতি বাঙাল রাজাকার, আল-বদর, আল-সামস তৈরি হয়ে গেল। ওরা বাঙালি! ওরাই আমাদেরকে সাহায্য করত। শহরের অলিতে গলিতে, গ্রামের আনাচে কানাচে ওরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। ওটা তাদের দেশ। পথঘাট ভাল চেনে। আমরা যেখানে পৌছতে পারতামনা সেখানে রাজাকারেরা সহজেই কাজ শেষ করে ফেলত। তাদের দিয়ে অনেক কাজ করানো যেত। যা বলতাম তা তৎক্ষনাত করে ফেলত, যা বলতামনা তাও করে এসে বাহাবা নিত। রাজাকারেরা আমাদের সব খবরাখবর দিত। মুক্তির খবর, সুন্দরী মেয়েদের খবর, কোন বাড়ীতে সোনাদানা আছে, টাকা পয়সা কোথায় আছে সব। অনেক সময় ওরা নিজেরাই লুট করে নিয়ে আসত। তার থেকে আমাদেরকে হিস্যা দিত। ধন সম্পদ লুট আর মেয়ে মানুষের কথা আমাদের মাথায় প্রথমেই আসেনি। বাঙাল রাজাকরেরাই এই বুদ্ধি দিয়েছিল।

কিছুক্ষন থেমে গুরগন খা আবার শুরু করল -

কিভাবে লুট আর নারী ধর্ষন শুরু হল তা আপকো বলি। তখন আমরা জয়দেবপুরে। রাজাকারেরা খবর দিল কয়েকটা গ্রাম পর এক ধনী লোকের মেয়ের বিয়ে। পাকিস্তান চায়না। টাকা পয়সা সোনাদানা অনেক আছে।

শুনেই আমরা ছয়জন ফৌজ আর ছয় জন রাজাকার গিয়ে পৌছলাম। সে বাড়ীর অবস্থা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম! চারদিকে দেয়াল। বাড়ীর কোন জেনানাকে চোখে পড়েনি। বাড়ীর পাশেই মসজিদ। বাড়ীর মালিক একজন মৌলানা ছাহেব, সাচ্চা মুসলমান বলে মালুম হল। তাকে তো হিন্দু বলে চালানো যাবেনা। রাজাকারেরা জানে কি বলে লুট করতে হবে। বলা হল সে মুক্তিকে সাহায্য করে। একজন রাজাকার বলল, তোমরা দাড়িঁয়ে দেখ আমরা কি করি।

বিয়ে বাড়ী। নারী পুরুষ বাড়ীতে গিজ গিজ করছে। একজন রাজাকার বাড়ীর ভেতর ঢুকেই এলোপাথারি গুলি শুরু করল। একটা চিৎকার হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। পারছেনা। কারন সব গেইটে আমরা দাঁড়িয়ে। দেয়াল টপকে দুজন পালাবার চেষ্টা করছিল। সাথে সাথে তাদের দেহ সেখানে পড়ে রইল। এ দৃশ্য দেখে আর কেউ দৌড় দেবার সাহস পেলনা। রাজাকারেরা বাড়ীর ভেতর ঢুকে সমস্ত জেনানা এনে দাড় করাল। অন্য পাশে সব মরদ।

মানুষগুলো তখন থর থর করে কাঁপছে। মহিলারা কেউ কেউ বাচ্ছা বুকে নিয়ে, ঘোমটা দিয়ে মৃতের মত দাঁড়িয়ে আছে। মরদরা অসহায়, ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

একজন রাজাকার বলল, তোমাদের যার যা গহনা আছে সব খুলে দাও! সাথে সাথে যার যা ছিল সব খুলে দিল। কিন্তু নববধু তার একটা আংটি দেয়নি। তাতে রাজাকারটা ক্ষেপে গিয়ে নববধুকে টেনে নিয়ে চলল একটা ঘরের ভেতর।

বাড়ীর মালিক মৌলানা ছাহেব রাজাকারটাকে বলল, বাবা সোলমান, তোর পায়ে পড়ি। তোর যা ইচ্ছে সব নিয়ে যা! আমার এ সর্বনাশটা করিসনে। ছেড়ে দে আমার মেয়েকে! কিন্তু তাতেও সে ছাড়ছে না দেখে দুলহা যেই এক পা এগিয়ে গেল অমনি বেয়নেটটা তার বুকে এফোড় ওফোড় হয়ে গেল। তারপর টেনে হিচড়ে দুলহানকে নিয়ে গেল ভেতরে।

বাইরে তখন এতগুলো মরদ থর থর করে কাপতে কাপতে, অর্ধমৃত চেহারা নিয়ে নিথর স্তব্দ হয়ে একবারে পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। কতক্ষন পর রাজাকারটা ঘর থেকে বের হয়ে এল। বাইরে তখন বহুত খুবছুরত জেনানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপছে। ওদের মধ্য থেকে দুজনকে ধরে নিয়ে চলল রাজাকারটা। একজন ছিল চৌদ্দ/পনের বছরের লাড়কি। আমরা দাঁড়িয়ে মজা দেখলাম। সেই চৌদ্দ বছরের লাড়কিকো উপহার দিল আমাদের কমান্ডারকে। আর জেনানাটা দিল আমাদের হাতে। তখন থেকেই শুরু হল লুট আর ধর্ষন। কমান্ডার বলত, রোজ রোজ নয়া নয়া আওরাত লাও। রাজাকাররা তাই করত। আমরাও ভাগ পেতাম।

রয়েল বেঙ্গলটা উঠে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে থর থর করে কাপছে। মাথায় আগুন জ্বলছে! হাত নিসপিস করছে! কি করবে! খুন করবে! খুন করে সোজা চলে যাবে এয়ারপোর্ট? কিন্তু পাসপোর্ট যে কফিলের হাতে! তাহলে ফাঁসিতে ঝুলবে! যেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াবে সামনে তাকিয়ে দেখে চার বছরের সাগর কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বলছে, এটা তো চলেনা, আর এট্টা বড় ঘোড়া আনব। হঠাৎ আনিসের কি হয়ে গেল! সাগরের দিকে তাকিয়ে বসে পড়ল! এলিয়ে পড়ল সোফায়। যেন কোন বোধ শক্তি নেই! ঘামে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। যদিও কামড়াটা শীততাপনিয়ন্তিত।

একজন উপযুক্ত শ্রোতা পেয়ে গুরগন খা বলতে লাগল। খাজানার মধ্যে চারটা বড় বালা ভি আছে। অনেক ওজন। আমরা তখন ঢাকা শহরে। আমাদের চেয়ে রাজাকারেরা বেশি তৎপর। আমরা যা পারিনি তারা তা অবলিলায় করে আসত। একদিন একটা রাজাকার এক খুবছুরত লারকির খবর দিল। তার বাবা স্বর্নের দোকানের মালিক। টাকার কুমীর। মেয়েকে ইচ্ছেমত গহনা তৈরী করে দিয়েছে। রাজাকারটা আগে থেকেই ওদেরকে চিনত।

দুজন রাজাকার আর দুজন ফৌজ গিয়ে উপস্থিত হলাম সে বাড়ীতে। ঘরে ঢুকেই রাজাকারটা ফাকা গুলি করল। তারপর ঘরের এক কোন থেকে বের করল বাড়ীর মালিক আর তার জেনানাকে। হাত জোড় করে থর থর করে কাপছে। একজন রাজাকার বলল টাকা পয়সা সোনাদানা যা আছে সব বের কর। সাথে সাথে তাদের সব এনে হাজির করল। তারা মনে করেছিল সব দিয়ে দিলে অন্তত প্রাণে বেঁচে যাবে। এত টাকা আর গহনা আর কোন বাড়ীতেই পাওয়া যায়নি।

একজন রাজাকার সবকিছু একটা পুটুলিতে বেধে বাঙালটাকে জিজ্ঞেস করল, তোর মেয়ে কোথায়?

লোকটা বলল, মেয়ে তো এখানে নেই! দেশের বাড়ীতে!

ঠিক করে বল্! কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস! বলে রাইফেলের বাট দিয়ে লোকটাকে আঘাত করতে লাগল। এক সময় লোকটা এলিয়ে পড়ল। তার জেনানা এগিয়ে এল সাহায্যে। তাকেও বেয়নেট দিয়ে একবারে নির্জীব করে ফেলে দিল। তারপর শুরু হল লারকিকে খোজা। সমস্ত বাড়ী খুজে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। রান্নাঘরের হাঁড়ি পাঁতিলের পেছনে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল একটা কামড়ায়। তারপর একে একে আমরা সবাই ভোগ করলাম। লারকিটা অজ্ঞান হয়ে মরার মত পড়ে রইল। একটা রাজাকার তার শরীরের সব গেয়না খুলে নিল। কিন্তু গোল বাধল হাতের বালা নিয়ে। কিছুতেই খোলা যাচ্ছেনা। এতনা খুবছুরত লাড়কি কভি নেহি দেখা। তার সুন্দর সুডৌল হাত দুটিকে টেনে, মুচড়ে, পা দিয়ে চেপে ধরে টানাটানি করেও খোলা গেলনা।

এতক্ষন রাজাকারের লীডারটা তদারকি করছিল এই অপারেশনটা। তাদের কাছে তখন একটা মানুষের চেয়ে একটা বালার দাম অনেক বেশি। সে হঠাৎ আদেশ দিয়ে বলল, "কাইট্টা ফালা হাত দুইটা!"

রয়েল বেঙ্গলটা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বিকট চিৎকারে ফেটে পড়ল! চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা! আর একটা কথা বলবি না! বলেই গুরগন খার কলার চেপে ধরল আনিস!

অপ্রত্যাশিত আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিলনা গুরগন খা। এতক্ষন মন দিয়ে শুনছিল, হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন বাঙালটা! আসলে যা ভেবেছিল বাঙালটা সে জাতের নয়! বোধ হয় আসল মোল্লা নয়! এতক্ষন সে অরণ্যে রোদন করছিল! তার চেহারায় ফুটে উঠেছে খুনীর শিরাগুলো। প্রতি আক্রমন করবে কিনা ভাবছে! চিৎকার শুনে আনিসের স্ত্রী ছবি ছুটে এল। এসেই দেখে লংকা কান্ড!

আরে! কর কি! কর কি! বিদেশে এসেও মারামারি শুরু করলে? তাও আবার মেহমানের সাথে? জোর করে গুরগনের কলারটা ছাড়িয়ে দিতেই আনিস নিস্তেজ হয়ে বসে পড়ল। জড়িত কণ্ঠে বলল, না......ও মেহমান নয়! ও খুনী! আমার মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী!

এ সুযোগে গুরগন খা বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে বিড় বিড় করল, তোমার মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী তোমার বাঙাল রাজাকারেরা। তাদের বিচার তো করতে পারনি!

-ঃ০ঃ-

১

[1]সদালাপ পড়ুন shodalap.com সদালাপে লিখুন editor@shodalap.com